The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.133 - 150)
Published in December, 2025

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা

মোঃ নুরুল হামিদ*

প্রতিপাদ্যসার: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আত্মপরিচয় প্রাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়। বাঙালির এই সংগ্রামে বাংলার সিংহভাগ জনগণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিলেও সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষ এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের সমর্থন করে এবং তাদের পক্ষে কাজ করে। ১৯৭১ সালের বহুকাল পূর্ব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে প্রথাগত চাকমা (রাঙামাটি), বোমাং (বান্দরবান) ও মং (খাগড়াছড়ি) সার্কেলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পাহাড়ের সব চেয়ে বড় জনগোষ্ঠী চাকমারা প্রথাগত রাজা ত্রিদিব রায়ের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী অনেকের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের চীফ তথা রাজা ত্রিদিব রায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত চাকমা সার্কেলের প্রধান হিসেবে তার প্রজাদের সিংহভাগ অংশকে সাথে নিয়ে ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষে কাজ করেন। এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রস্থান করে বিশ্বময় পাকিস্তানের পক্ষে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। জাতিসংঘসহ বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেন। ১৯৭২ সালের দালাল আইনে তালিকাভুক্ত এই স্বাধীনতা বিরোধী চাকমা রাজা আমৃত্যু পাকিস্তান প্রেম ত্যাগ করতে পারেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে।

ভূমিকা

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের ধারণায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মূলত উনিশ শতক থেকেই শুরু হয় আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ধারণা। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত ঐতিহ্য চেতনার সামগ্রিক ফসল জাতীয়তাবোধ এবং তার ফলেই জাতি রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে তার রূপরেখায় বাঙালির জাতীয়তাবোধ পূর্ণতা পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ শোষণের ইতিহাস প্রমাণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বকীয় সত্ত্বায় চিহ্নিত ও প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীকার ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মত স্বাধীনতার আন্দোলন। দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্রের অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের পটভূমিতে বাঙালি স্বাধীনতার সোপান রচনা করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত পাহাড়ি জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রামেও এসে পড়েছিল। ১৯৭১ সালে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা ও তিনটি মহকুমা সদরে বিভক্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সমতল অঞ্চলের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিল। পাহাড়ে সাধারণ বাঙালির তুলনায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি ছোট অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও সিংহভাগ অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে মূল প্রশাসনের অংশ জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পাশাপাশি প্রথাগত চাকমা, বোমাং ও মঙ সার্কেল নামে তিনটি আলাদা স্থানীয় ঐতিহ্যগত শাসনে বিভক্ত ছিল। প্রথাগত ঐ সার্কেল প্রধানকে স্থানীয় সাধারণ জনতা শত বছর ধরে রাজা হিসেবে আনুগত্য করে আসছিল। স্থানীয় সাধারণ পাহাড়ি জনতা প্রশাসনিক, রাজস্ব, সামাজিক বিচার, ধর্মীয় দায়বদ্ধতা ও ঐতিহ্যগত কারণে রাজার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চাকমা সার্কেলের রাজা ত্রিদিব রায় ও বোমাং সার্কেলের রাজার

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞাতিভাই রাজপুত্র ও ভবিষ্যত রাজা অং শৈ প্রু চৌধুরী সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেন। একই সাথে পাহাড়ের উত্তরাংশে মঙ সার্কেলের রাজা কুমার মপ্রু সেইন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ চাকমা সার্কেলের রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তার প্রজাদের সিংহভাগ অংশ তাকে অনুসরণ করে। ত্রিদিব রায়ের প্রজারা স্বাধীনতা বিরোধী কাজে অংশ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ পাহাড়ি ও বাঙালির উপর নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু করে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে রাজা ত্রিদিব রায় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রস্থান করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। শত চেষ্টার পরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আটকাতে না পেরে ত্রিদিব রায় হতাশ না হয়ে বিশ্বময় বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে আনা প্রস্তাবে বিরোধিতা করতে প্রেরিত পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ত্রিদিব রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এমনকি আমৃত্য পাকিস্তান প্রেমি রাজা ত্রিদিব জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পাকিস্তানের মাটিতেই ত্যাগ করেন।

রাজা ত্রিদিব রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় ও রাজমাতা বিনীতা রায়ের প্রাসাদ আলোকিত করে ১৯৩৩ সালের ১৪ মে রাঙামাটিতে রাজপুত্র ত্রিদিব রায়ের জন্ম। কামানের আনুষ্ঠানিক তোপধ্বনি ও চাকমা রাজপ্রাসাদে নানারূপ আয়োজনের মাধ্যমে তার জন্মক্ষণ উদ্‌যাপিত হয়। তরুণ যুবরাজ হিসেবে তাকে ঐতিহ্যবাহী চাকমা রীতিতে গড়ে তোলা হয়। চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাস্টিকা কনভেন্ট-এ তার স্কুল জীবন শুরু হয় পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল এবং ভারতের কুরসেওং-এ স্কুলে তা অব্যাহত রাখে। ২০ বছর বয়সে ত্রিদিব রায় আইন পড়ার জন্য লন্ডনের ইনস অব কোর্স স্কুল অব ল'তে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়। লিংকনস ইন এর সদস্য হিসাবে ১৯৫৩ সালে ত্রিদিব রায় ব্যারিস্টার এট-ল অর্জন করেন। ১৯৫২ সালের ৭ অক্টোবর রাজা নলিনাক্ষ রায় ৪৯ বছর বয়সে মারা গেলে তার পুত্র ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ ৫০তম চাকমা রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে রাণী আরতি রায়কে বিয়ে করে সংসার ও রাজত্ব একসাথে পরিচালনা শুরু করেন। রাজা ত্রিদিব রায় খুব দ্রুতই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পাশাপাশি বাঙালি জনগোষ্ঠীর অনন্য সমাবেশ নিয়ে বৈচিত্রতায় পূর্ণ এ পাহাড়ি জনপদ। ভূ-প্রকৃতি ও নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। বর্তমানে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন প্রশাসনিক পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৪ বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ (ইবরাহিম ১৭-১৮)। বাংলাদেশের এই ভূ-ভাগটি পার্বত্যাঞ্চল নামে খ্যাত। দক্ষিণ এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কিছু অংশ এই জনপদে বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ২১°২৫ হতে ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৪৫ হতে ৯২°৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত (Ishaq 1-2)। ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা থেকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করা হলেও ব্রিটিশ সরকার ১৮৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ নতুন জেলার সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। পরবর্তীতে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা চিহ্নিত হয়। উত্তরে ফেনী নদী থেকে দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে রেনেলের মানচিত্রে অংকিত মগ পর্বত থেকে পশ্চিমে সমতল চট্টগ্রামের পূর্ব সীমানা দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা চিহ্নিত হয়

(কানুনগো ১৭-১৮)। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ডটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'Imperial Gazetteer of India'-তে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া আছে এভাবে-

> Chittagong Hill Tracts – A Frontier District in the Chittagong Division of Eastern Bengal and Assam, lying between 21°11´ and 23°47´ N. and 91°41´ and 92°42´ E., with an area of 5,138 square miles. It is bounded on the north by the State of Hill Trippera; on the west by Chittagong District; on the south by Arakan; and on the east by the Nothern Arakan District of Burma and the Lushai Hills District of Assam. Between the plains of Bengal and those of Upper Burma stretches a hilly tract of primaeval forest, bounded on the north by the State of Hill Tippera and by Assam, and on the south by the Burmese province of Arakan. A Succession of hill ranges runs from north-west to south-west; determining the geographical and ethnical division of the whole country into three oblong strips, of which the most westerly is known as the Chittagong Hill Tracts; the central strip constitutes the Lushai Hills and the eastern the Chin Hills, which from part of Upper Burma (Imperial Gazetteer 407-408).

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিবর্তন: সার্কেল প্রথার উদ্ভব

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের অংশ হিসাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার হরিকেল জনপদের অংশ ছিল। ১৮৬০ সালের পূর্বেও এই জনপদ চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশরা সমতল চট্টগ্রাম থেকে এ অঞ্চলকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রধানত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস দীর্ঘ হলেও তার মূল উপাদানগুলো সহজলভ্য নয়। প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামের সমুদ্রঘেঁষা পশ্চিমের সমতলে চট্টগ্রামী বাঙালিদের বসবাস। এই ভূখণ্ডের সামান্য পূর্বাংশের দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে কুকি, চীন ভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ভূক্ত অল্প কিছু মানুষ এখানে যাযাবরীয় জীবনযাপন করত। এ সম্প্রদায়গুলোর মূল আবাস পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, মিজোরাম, আরাকান ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চল। তারা মূলতঃ চারটি অঞ্চল থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে, অঞ্চলগুলো হলো উত্তর বার্মা, দক্ষিণপূর্ব চীন, দক্ষিণের আরাকান ও উত্তরের ত্রিপুরার পার্বত্যাঞ্চল (কানুনগো ২১)। পার্বত্যাঞ্চলে শতশত বছর ধরে আগত অধিবাসীরা প্রায় সবাই পুরুষানুক্রমে পার্বত্য জনপদে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের পূর্ব পুরুষরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেছে নিয়ে সেখানে বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের বাসভূমি পর্বত শ্রেণীর অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হতো এবং পর্বত শ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত থাকতো। পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দৈহিক গড়ন, ভাষা, আচার-আচরণ, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোক-কাহিনী, সংস্কৃতি, সামাজিক আইন-কানুন, প্রথা ও সাহিত্য ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের থেকে ভিন্ন ধারার। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা, বোম, পাংখোয়া, চাক, খ্যাং, খুমী, লুসাই, কুকি উল্লেখযোগ্য। বসতি স্থাপন করার পরপরই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোকজন নিজেদের উদ্ভাবিত নিয়মনীতি অনুসারে গোষ্ঠীপতির অধীনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করে। প্রতিটি গোষ্ঠী স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পাশাপাশি অন্য গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতো। ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীই ছিল স্বশাসিত এবং অন্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। তবে সব গোষ্ঠীই যে পুরোপুরি স্বাধীন ছিল এ কথা বলা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ তিনটি স্থানীয় প্রথাগত স্বতন্ত্র শাসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়ভাবে এই প্রথাগত শাসনের প্রধানকে রাজা বলে সম্বোধন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো চাকমা, বোমাং ও মঙ রাজ্য নামে এরূপ তিনটি প্রথাগত শাসনের প্রচলন রয়েছে। পাহাড়ের বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা ঐতিহ্যগত, ধর্মীয়, রাজস্ব সংক্রান্ত, স্থানীয় প্রশাসনিক ও সামাজিক বিচারিক ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রয়োজনে এই রাজাদের প্রতি ব্যাপক আনুগত্য প্রদর্শন করে।

ব্রিটিশ শাসনপূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতীয় জনগণ শতবছর ধরে এক ধরণের স্বতন্ত্র শাসনাধিনে ছিল। ১৭৬১ সালে স্যার হ্যারি ভেরেলস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে চট্টগ্রামের কাউন্সিল প্রধান হিসাবে যখন দায়িত্ব হাতে নিচ্ছিলেন ঠিক সমসাময়িক সময়ে চট্টগ্রামের পূর্ব দিকের পাহাড়ি জনপদের 'কার্পাসমহল' এর স্বতন্ত্র শাসক ছিল চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁ। ব্রিটিশ শাসনের বহু পূর্ব থেকেই ঐ অঞ্চলে চাকমা শাসনের অস্থিত্ব ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থসমূহে চাকমা রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার রাজমালায়ও চাকমা রাজ্যের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও আনুমানিক ১৫৫০ সালে খ্যাতমান পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোয়াও ডি ব্যারোস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'ডা এশিয়াতে' বাংলা রাজ্যের মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর উজানে 'চাকোমাস' নামে যে স্থান চিহ্নিত করেছেন তা চাকমা রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় (কানুনগো ৮৬-৮৭)। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ঘোষণার বহু আগে থেকেই পূর্বের পাহাড়ে স্বতন্ত্র চাকমা রাজ্য ছিল (Ishaq IV)। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরেকজন পার্বত্য রাজা কার্পাসমহলের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পালন করত। তিনি হলেন বোমাং জাতির সর্দার কং হ্লা প্রু। তিনিই বোমাং সার্কেলের রাজাদের পূর্ব পুরুষ। সাঙ্গু নদীর দক্ষিণ তীরে বোমাংদের জমিদারি ছিল (চাকমা ২৪-২৫)। ১৭৯০-১৭৯১ সালের দিকে কোম্পানি সরকার চাকমা রাজা জান বক্স খাঁ ও বোমাং রাজা কং হ্লা প্রু-র সাথে 'কার্পাসতুলা'কে খাজনা হিসাবে আদায়ের একটি দশসনা চুক্তি সম্পাদন করেন (Rickets 78-100)। চট্টগ্রামের উত্তর-পূর্বাংশে আরেকজন 'মান রাজা' বা 'মঙ্ বা মগ' বা মারমা সর্দারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যার পরবর্তী প্রজন্ম ব্রিটিশ প্রশাসক লুইনের বদান্যতায় তৎকালীন রামগড় মহকুমার অধীনে মানিকছড়িতে মানরাজা বা মঙ্ সার্কেলের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি পায় (বাহাদুর ৭৬-৭৭)। উল্লেখ্য ইংরেজরা চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তের কিছু অংশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ অংশে পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব দিকের পার্বত্যাঞ্চলকে শুধুমাত্র নিয়মিত জেলা হিসাবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়ে কোম্পানী সরকার দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করে। এ শাসনে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে উপজাতীয় রাজাদের নিয়োগকৃত হ্যাডম্যান ও কার্বারীদের হাতে। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Indian Council Act XXII of 1860' এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা জেলা ঘোষণা করে।

মোঘল আমল থেকে পাহাড়ে গ্রাম প্রধানকে 'কার্বারী' বলা হত। ব্রিটিশ শাসনের সময় রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ সহজ করার জন্য 'মৌজা' সৃষ্টি করা হয়। মৌজা প্রধানের পদের নাম দেওয়া হয় 'হ্যাডম্যান'। ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৪ সালে 'Territorial Circle in Chittagong Hill Tract' আইনের মাধ্যমে চাকমা রাজ্যকে বিভক্ত করে পৃথক মঙ্ সার্কেল গঠন করে সার্কেল প্রধানকে চীফের মর্যাদা দান করে। পরবর্তীতে 'Rules for the Administration of CHT-1892' আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চারটি সার্কেলে (চাকমা, বোমাং, মঙ্ ও সংরক্ষিত বন) বিভক্ত করে। প্রধান তিন সার্কেলকে ৩৩টি 'ব্লকে', ব্লকগুলোকে 'তালুকে' এবং তালুক গুলোকে 'মৌজায়' বিভক্ত করে। হ্যাডম্যানদের সুপারিশে রাজা তথা সার্কেল প্রধান কার্বারী নিয়োগ দেয় আবার রাজার বিশেষ সুপারিশে ডিসি হ্যাডম্যানদের নিয়োগ দেয় ফলে হ্যাডম্যান ও কার্বারীদের উপর সার্কেল প্রধানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। 'The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900' অনুযায়ী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে (চাকমা, বোমাং ও মঙ্) বিভক্ত করা হয়। উপজাতীয় রাজাদের সার্কেল প্রধান করা হয় একই সাথে মহকুমা প্রশাসনও বহাল রাখা হয়। সার্কেল প্রধানরা সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায়, উপজাতীয় সংস্কৃতি ও প্রশাসন বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করত। মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব ছিল নিয়মতান্ত্রিক সরকারী প্রশাসন ঠিক রাখা। এই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা পাকিস্তান আমল এমনকি বর্তমান বাংলাদেশেও পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান হিসাবে চালু আছে (ইবরাহিম ২৮)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয় জনগণের বসবাস হওয়ার পরেও এই এলাকাকে মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হয়। তিনটি সার্কেলের প্রধানরা তাদের এখতিয়ারাধীন অঞ্চলকে 'নেটিভ স্টেটস' হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করলেও তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে নানা

নাটকীয়তার পর ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পাহাড়ি জেলাটিকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি

১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কখনোই জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হয়নি। অবশেষে রাজনীতির চরম চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ভাষণেই সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ৮৮% জনগণই ছিল উপজাতীয় জনগণ যাদের উপর পার্বত্য সার্কেল চীফদের বিস্তর প্রভাব ছিল যা পাহাড়ের নির্বাচনে জয় লাভের ক্ষেত্রে 'এক্স ফ্যাক্টর' হিসাবে কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভীত মজবুত ছিল না। সাংগঠনিক শক্তির অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৬২ নং আসন থেকে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে নৌকা প্রতীকে নির্বাচনের অনুরোধ করলেও চাকমা রাজা তা প্রত্যাখ্যান করেন (Roy 202)। জাতীয় পরিষদে ১৬২ নং আসনে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান চারু বিকাশ চাকমাকে প্রার্থী করলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায়ের কাছে হেরে যায়। জাতীয় পরিষদে একই আসনে বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী স্বতন্ত্র নির্বাচন করে ২২,৫৪০ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে (আরেফিন ৬৪)। জাতীয় পরিষদে বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ত্রিদিব রায়ের কাছে হেরে গেলেও প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণের আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বোমাং রাজার জ্ঞাতি ভাই, বোমাং সার্কেলের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রাজপুত্র অং শৈ প্রু চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দুর রহমানের মধ্যে। এই আসনেও পাহাড়ী জনগণ আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বদলে রাজ পরিবারের সদস্য অং শৈ প্রু'কে নির্বাচিত করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী চাকমা রাজপরিবারের সদস্য কে.কে. রায় পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এন. লারমার কাছে হেরে যায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পরাজয়ের পেছনে পাহাড়ী জনগণের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতের পাশাপাশি রাজ পরিবারগুলোর প্রতি আনুগত্য, সমতলের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আনানুগত্য ও আস্থাহীনতার পরিচয় স্পষ্ট করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়, বোমাং রাজপুত্র অং শৈ প্রু চৌধুরী ও পাহাড়ী নেতা এম.এন লারমার প্রতি পাহাড়ি জনতার আস্থা প্রমাণিত হয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর আরো বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে এককভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও রাজনৈতিক এলিটরা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করেন। ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেন। নির্বাচনের পর নানা নাটকীয়তার পর ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলেও হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করা হয় (চৌধুরী ৫৪)। এই ঘোষণার পরপরই জনতা রাজপথে নেমে এসে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কফিনে শেষ পেরেক মারার আয়োজন সম্পন্ন করে। ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার কনস্যুলেট আর্চার ব্লাডের দৃষ্টিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের পর পাকিস্তানের টিকে থাকার সম্ভাবনা ১:১০০ তে নেমে আসে (Blood 156-157)। সারাদেশে একযোগে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ভাষণে যার যা আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন।

১৯৭১ সালে রাঙামাটি সদর, কাপ্তাই, রামগড় ও বান্দরবান ছিল পাহাড়ের জনবহুল জনপদ। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এ জনপদগুলোতেও আন্দোলনের ঢেউ লাগে। জেলা সদর রাঙামাটি ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে নিয়মিত

যোগাযোগ রক্ষা করে জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতের সাথে একাট্টা হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের বাঙালিদের পাশাপাশি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটা ছোট অংশ এই আন্দোলনে শরীক হয়। ১৯৭১ সালে প্রথাগত তিনটি সার্কেলের প্রধান তথা রাজা ছিল যথাক্রমে- চাকমা সার্কেলে রাজা ত্রিদিব রায়, বোমাং সার্কেলে ঐ সময় ১৪তম বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী সার্কেল চীফ থাকলেও সার্কেল জুড়ে প্রজাদের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত রাজার জ্ঞাতি ভাই ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী অং শৈ প্রু চৌধুরী প্রভাব বিস্তার করতেন। উত্তরের মঙ্ সার্কেলে চীফ ছিলেন মঙ্ প্রু সাইন চৌধুরী। যুদ্ধ শুরু হলে এই সার্কেল চীফ, তাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারী ও সার্কেল অধীনস্থ প্রজাদের স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে ভূমিকা নিতে দেখা যায়।

১৯৭১ সালে রাঙামাটির পৌর অধিকর্তা ছিলেন মুসলীম লীগ নেতা তফজ্জল হোসেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ত্রিদিব রায় প্রাথমিক পর্যায়ে নির্লিপ্ত থেকে গোপনে পাকিস্তানীদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। এম.এন লারমা আত্মগোপনে এবং চারু বিকাশ চাকমা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে রাঙামাটির মুক্তিকামী প্রশাসন ও মুক্তিপাগল জনতাকে কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনার দিকে তাকাতে হচ্ছিল। কেননা সেখানে রাজনীতি সচেতন সংগ্রামী জনতার সংখ্যা ছিল বেশি। একই সময়ে উত্তরের সীমান্ত জনপদ রামগড়েও মুক্তিপাগল জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্ররা ৩ মার্চের হরতালের সমর্থনে রাঙামাটি শহরে মিছিল বের করে। মিছিলটি বনরূপা, রিজার্ভবাজার হয়ে তবলছড়িতে গিয়ে শেষ হয়। দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাঙামাটির ছাত্রজনতা, নানান শ্রেণীর পেশাজীবী জনতা ও প্রশাসনের একটি অংশ জাতীয় রাজনীতির সাথে সমন্বয় করে আন্দোলন চালিয়ে নিচ্ছিল (রণ ত্রিপুরা ২০১৮)। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই রাঙামাটির ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের সহায়তা করে জেলা প্রশাসক এইচ.টি ইমাম, এডিসি সৈয়দ আবদুস সামাদ, সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এম.ই শরীফ, রাঙামাটি সদরের এসডিও আবদুল আলী, এসপি বজলুর রহমান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা হাজ্বী নওয়াব মিয়া, সৈয়দুর রহমান, মুন্সি মিয়া সওদাগর ও আলম ডকইয়ার্ডের সামসুল আলম। ৩-৫ মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্র ঘোষিত সকল কর্মসূচি রাঙামাটিতে ব্যাপকভাবে পালিত হয় (সুনীল দে ২০২০)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিকে আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল দুর্বল অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশ। দেশের রাজনীতির এমন ক্রান্তিলগ্নে উপজাতীয় জনগণের অবস্থা জানার জন্য এডিসি সামাদ সদর মহকুমার সার্কেল অফিসার প্রভাত চাকমাকে বিদ্যমান অস্থিতিশীল পরিবেশে পাহাড়ের জনগণের প্রতিক্রিয়া জানানোর নির্দেশ দেয়। মাঠ পর্যায়ে শুরু থেকে কর্মরত এসডিও আবদুল আলী, ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ, রাঙামাটি কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ার আলী ৬ মার্চ একযোগে জানায় যে, দেশের এই অস্থিতিশীল অবস্থায় উপজাতীয় জনগণ বেশ ভীতসন্ত্রস্ত। প্রভাত চাকমাও একই রিপোর্ট দেন। এডিসি সামাদ ৬ মার্চ সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। গুজব রটে যায় যে, শেখ মুজিব ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। ইতোপূর্বে গোপন ইশতেহার, বিল, হ্যান্ডনোট, লিফলেট ছাত্রদের মাধ্যমে শহরে পৌঁছে যায় (সামাদ ২৫-২৬)। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু'র মুক্তিসংগ্রামের ডাক ও সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়ার পর পাহাড়ি জনপদ রাঙামাটি উত্তাল হয়ে পড়ে। কোন অদৃশ্য কারণে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও বোমাং রাজপুত্র অং শৈ প্রু চৌধুরী অনেকটা আত্মগোপনে চলে যায়। ৭ই মার্চের ভাষণ পরবর্তী রাঙামাটির অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এইচ.টি ইমাম লিখেন-

> ৭ মার্চের পর বিভিন্ন সময় ঢাকা থেকে আমাদের কাছে বুলেটিন আসতে শুরু করে। জাতীয় পতাকার নমুনা (পতাকায় সোনালি রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র); জাতীয় সংগীত ('আমার সোনার বাংলা' পুরোটাই); স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে থাকলাম। অবশ্য এর অনেক আগেই ছাত্ররা স্বাধীনতার কথা বলে ফেলেছে।...৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর রাঙামাটিতে সবকিছু বুঝে গোছাতে আমাদের কয়েকদিন সময়

> লেগেছিল। ১০-১১ তারিখের দিকে ছাত্রমহল থেকে সঠিক সংবাদ পাওয়া শুরু করলাম। ইতোমধ্যে একদিন আমার সি.এ (কনফিডেনসিয়াল এসিস্ট্যান্ট) কাজী মাইনুদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া, বাংলাদেশের পতাকার নমুনা এবং 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত ঘোষণার কাগজপত্র এনে দেখালেন। ঢাকার সাথে ছাত্রদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, সে সুবিধা আমাদের ছিল না। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার একেবারে অচল হয়ে যায় (২৫৭-২৫৮)।

৮ মার্চ ছাত্রজনতার নেতৃত্বে রাঙামাটি শহরে স্মরণকালের বৃহত্তর জঙ্গি মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে ছাত্ররা আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দুর রহমানের বাসায় জরুরী সভায় মিলিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা হাজী নওয়াব মিয়া, সৈয়দুর রহমান, মুন্সি মিয়া সওদাগর, সামসুল আলম, কুতুব উদ্দীন, আতিকুর রহমানসহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতে ৯ মার্চ ছাত্রনেতা গৌতম দেওয়ানকে আহ্বায়ক ও সুনীল কান্তি দে'কে সদস্য সচিব করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট রাঙামাটি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় (দেওয়ান ২০১৯)। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ৮ মার্চ থেকে রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, স্টেশন ক্লাব, আলম ডকইয়ার্ডে মুক্তিকামী জনতা মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শুরু করে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া প্রশিক্ষণার্থীদের বেশিরভাগ পাহাড়ের বাঙালি নাগরিক হলেও পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ছিল তুলনামূলক অনেক কম (টীকা)। মার্চের মাঝামাঝিতে রাঙামাটির স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সম্ভাব্য পাক আক্রমণ প্রতিহত করতে কাপ্তাইয়ে পিডিবির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন, শ্রমিক নেতা রশিদ আহমদ চৌধুরী, পিডিবি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রশিদের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় (পিন্টু ২০১৮)। কাছাকাছি সময়ে চন্দ্রঘোনা পেপার মিল এলাকায় কেপিএম এর জুনিয়র অফিসার আলী আহমদ ও স্টোরকিপার নুরুন্নবীকে দায়িত্ব দিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় (চৌধুরী ২০১৮)। ১৬ মার্চ উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর রামগড়ে কাজী রুহুল আমীন ও সাংবাদিক সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরাকে দায়িত্ব দিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় (হেমদা ত্রিপুরা ২০২২)। খাগড়াছড়িতে দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও মোঃ নূর এলাহি'র নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় (দোস্ত চৌধুরী ২০১৭)। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে মহকুমা শহর বান্দরবানে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুর রহমান ও মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বান্দরবান সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। বান্দরবানে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলেও গহীন পাহাড়ি অরণ্য ধোপাছড়িতে বান্দরবানের মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেননা বোমাং রাজপুত্র অং শৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তানীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল (ওয়াহাব ২০১৯)।

দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থায় ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত চলমান শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা কোন প্রকার সমাধান ছাড়া শেষ হয়। মূলত আলোচনার আড়ালে প্রেসিডেন্টের আদেশে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ১৮ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের বাঙালি নিধন পরিকল্পনা তৈরি করে ২০ মার্চ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নেয় (সালিক ৬৮-৬৯)। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারা দেশব্যাপী পাক সেনা মোতায়েন অব্যাহত থাকে। আশানুরূপ ফলাফল ছাড়া আলোচনা ভেঙে গেলে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের দুই-তিন ঘন্টা পর শুরু হয় শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম বাঙালি হত্যাযজ্ঞ। ঢাকার মত চট্টগ্রামেও শুরু হয় গণহত্যা। একই সাথে শুরু হয় বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধ।

চট্টগ্রামের পতন ও মুক্তিযোদ্ধাদের পার্বত্য চট্টগ্রামমুখী পশ্চাৎপসারণ

চট্টগ্রামে 'অপারেশন সার্চলাইট' সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, ইবিআরসি ও চট্টগ্রাম বন্দরে আংশিকভাবে এটি অভিযান পরিচালিত হয়। চট্টগ্রামের দখল নিতে পাক বাহিনীকে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, এ সময় পাক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক গণহত্যা সংগঠিত হয়। পাক বাহিনী 'অপারেশন গ্রেট ফ্লাই ইন' ও 'সন্ধান ও উচ্ছেদকরণ

অপারেশন' এর মাধ্যমে দেশব্যাপী গণহত্যা ও নির্যাতন চালানো শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম শহরের পতনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের যুদ্ধ পরিস্থিতির ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে। মূলত চট্টগ্রাম শহরের পতনের পর পাক বাহিনী সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রসারণ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে শুরু করে ব্যাপক তাণ্ডবলীলা। ৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের পতন ঘটে। ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ কালুরঘাটের পতন হয়। পতনের পর পাকিস্তানি বাহিনী উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া শুরু করে। হানাদার বাহিনীর একটি দল হাটহাজারী-ফটিকছড়ি হয়ে রামগড়ের পথে, দ্বিতীয় দলটি হাটহাজারী হয়ে রাউজানের দিকে, তৃতীয় দলটি কালুরঘাট-মধুনাঘাট-রাঙ্গুনিয়া হয়ে কাপ্তাইয়ের দিকে এবং সর্বশেষ গ্রুপটি জল ও স্থলপথ মিলিয়ে কক্সবাজার মহকুমার দিকে যাত্রা করে (ইসলাম ১৭৭-১৮৪)। মূলত কাপ্তাই ও রাউজানের দখল নেওয়ার পর পাক বাহিনী রাজা ত্রিদিব রায়ের আমন্ত্রণে এবং কক্সবাজারমুখী কলামটি বোমাং রাজপুত্র অং শৈ প্রু চৌধুরীর সমর্থনে রাঙামাটি ও বান্দরবানে প্রবেশ করে গণহত্যা ও নির্যাতন শুরু করে। একই সময়ে মানিকছড়ির মঙ্ সার্কেলের রাজা মঙ্ প্রু সাইং পুরো পরিবার ও প্রজাদের সাথে নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে সরাসরি যোগদান করেন।

কালুরঘাটের পতনের পর মুক্তিবাহিনী পশ্চাৎপসারণ করে পটিয়া, কাপ্তাই হয়ে রাঙামাটিতে অবস্থান গ্রহণ করে। হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু নিয়ে কাপ্তাই ও রাউজানে প্রবেশ করে। ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ পাক বাহিনী বিনা বাধায় রাঙ্গুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অতিক্রম করে চন্দ্রঘোনায় এবং ১৪ এপ্রিল ভোর নাগাদ কাপ্তাই দখল করে (সালিক ৯৪)। এদিকে ১৩ এপ্রিল সকাল ৮:০০ টায় অন্য গ্রুপটি হাটহাজারী হয়ে রাউজানে প্রবেশ করে তাণ্ডবলীলা শুরু করে (আমীন চৌধুরী ৭৩)। দখল নেওয়ার পর ১৩ এপ্রিল থেকে কাপ্তাই ও রাউজানে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করলেও ঘন অরণ্য বেষ্টিত পাহাড় ও লেক দিয়ে ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা শহর রাঙামাটিতে প্রবেশে সময় নিচ্ছিল। উল্লেখ্য, মার্চের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে রাঙামাটিতে পাক সামরিক বাহিনী ও পাক প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা

'The CHT Regulation, 1900' অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের অফিসার ইনচার্জের পুরাতন পদবী সুপারিনটেনডেন্ট প্রত্যার্পণ করা হয়। একই আইনে চাকমা, বোমাং ও মঙ্ সার্কেল বলবৎ রেখে স্ব স্ব সার্কেল চীফদের কাছে রাজস্ব আদায়সহ নিজ নিজ এলাকার অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চাকমা সার্কেলের অধীনে জেলার মধ্যবর্তী ও উত্তরাঞ্চল, বোমাং সার্কেলের অধীনে দক্ষিণাঞ্চল ও মঙ্ সার্কেলের অধীনে থাকে পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। সার্কেলের আওতাভূক্ত উপজাতীয় লোকজন অধীভূক্ত সার্কেলের চীফকে 'রাজা' হিসেবে আনুগত্য করত। সার্কেলের সীমানা অনুসরণ করে ৩টি মহকুমা সৃষ্টি করে এসডিও নিয়োগ করা হয়। মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব ছিল সার্কেল চীফদের কার্যাবলী তদারকী ও লিঁয়াজো করা (আহমদ ১৬-২০)। ১৯৭১ সালে পাহাড়ের সিংহভাগ অধিবাসীই ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বোপরি আধুনিক পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকা পিছিয়ে পড়া এই পাহাড়ি জনতা নানান কারণে চীফ তথা রাজার প্রতি অন্ধভাবে অনুগত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সার্কেল প্রধানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রজারা যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভাগ সম্পন্ন হওয়ার পরেও ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাঙামাটিতে ভারতীয় ও বান্দরবানে বার্মার পতাকা উড়তে দেখা যায় এবং ডেপুটি কমিশনার কর্নেল জি.এল হাইড সেটা প্রত্যক্ষ করে (Ali 171)। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিজেদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে পাহাড়ের অমুসলিম উপজাতীয় নেতা ও জনতার মধ্যে সৃষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাবের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হয়। এই সংযুক্তি পাহাড়ি জনতা ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেনি। ১৯৫২ সাল থেকে

চাকমা রাজার সাথে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সখ্যতা শুরু হয়। ভাষা আন্দোলন একদিক থেকে চাকমা রাজাকে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আরো কাছে নিয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায়ের রাজনীতি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচন পরবর্তীতে বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে রাজার গঠন প্রকৃতি এবং ঐ সময়ের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন হয় তার ভেতরকার অব্যাহত বিচ্ছেদ এর প্রকৃতি ও মাত্রা প্রকাশে সহায়তা করে। একথা সত্য যে, আওয়ামী লীগ সবসময়ই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত চাকমা রাজ্যের বিরোধী ছিল। এটি এ কারণে নয় যে একজন বংশানুক্রমিক রাজা এটা শাসন করত। এর মূলে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একটি বর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে রাজার প্রত্যাখ্যান এবং আইয়ুব খানের সাথে ত্রিদিব রায়ের সুসম্পর্ক। রাজা ত্রিদিব রায়ও ৬ দফা সমর্থন করেননি। ত্রিদিব রায় সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখতেন। রাজা ত্রিদিব এ কারণে শঙ্কিত ছিলেন যে, ছয় দফা কর্মসূচির সাফল্যের অর্থ দাঁড়াবে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সুরক্ষামূলক ছত্রছায়ায় রাজা যে স্বায়ত্তশাসন এবং বিশেষ মর্যাদা ভোগ করছিলেন তা হারাতে হবে (দেবসরকার ৪৮-৫২)। ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা চলাকালে আইনের ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ত্রিদিব রায় এই মামলা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রাজা উপলব্ধি করছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর এবং সে কারণে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য ও বিবৃতি তিনি দেননি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে জয় পান। কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের আশ্বাসের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ত্রিদিব রায়ের আওয়ামী লীগে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ মর্যাদার প্রশ্নে গোঁ ধরার ব্যাপারটি পরস্পর স্ববিরোধী। ১৯৪৭ সালের অনুরূপ দ্বিতীয়বারের মত ১৯৭১ সালে পাহাড়ী রাজাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান সার্কেলভুক্ত সাধারণ প্রজাদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এতে পাহাড়ীদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে তারা দলে দলে পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করে। এদিকে নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে কালুরঘাট থেকে পশ্চাদগামী মুক্তিযোদ্ধারা রাঙামাটি শহর থেকে ৪৮ মাইল উত্তরে পাহাড় ও হ্রদ বেষ্টিত গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী মহালছড়িতে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে (Shawkat Ali 111-113)।

প্রতিবছর ১২-১৪ এপ্রিল রাঙামাটি শহরে 'Bizu' অনুষ্ঠানের কারণে শহর জনাকীর্ণ থাকলেও ১৯৭১ সালের পহেলা বৈশাখের সকালটা ছিল থমথমে। স্থানীয় সাধারণ জনতা ও স্বাধীনতাকামীরা ইতোপূর্বে কিছু অংশ বরকল হয়ে পূর্বদিকে মিজোরামের দেমাগ্রিতে, কিছু অংশ মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি-রামগড় হয়ে ত্রিপুরার সাবরুমে আশ্রয় নেওয়ায় রাঙামাটি শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। পাকিস্তানপন্থী কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মুসলিম লীগের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের অনুগত প্রজা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষীয় সবাই রাঙামাটি ত্যাগ করে। ১৪ এপ্রিল বিকেল ৪ টায় জেলা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট এম.এম আলী, ম্যাজিস্ট্রেট মোনেম চৌধুরী, মুসলিম লীগ নেতা সৈয়দ তফাজ্জল হোসেনসহ একটি প্রতিনিধিদল ত্রিদিব রায়ের সাথে রাজ দরবারে সাক্ষাৎ করে। ৬-৭ জন লোকের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে ত্রিদিব রায় প্রাসাদের ড্রয়িংরুমে বসিয়ে সবাইকে 'Gur or Molasses'-এর চা পরিবেশন করে (টীকা)। ইতোপূর্বে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে প্রধান সমন্বয়ক করে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে রাঙামাটি শহরে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। মুসলিম লীগ নেতা তফাজ্জল হোসেন, উকিল আহমুদুল হক, হাজ্বী আবদুস সাত্তার, মোস্তাফিজ খলিফা, গফুর হাজ্বী, নজরুল ইসলাম, কুদ্দুস মাস্টার, মমতাজ কন্ট্রাক্টর, সোলায়মান মেম্বার, সিতারাম সাংঘা, সাইজা প্রু মগ, কাঠ ব্যবসায়ী সেলিম ও সোনা সওদাগর শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও স্থানীয় বিহারী যুবক ও উপজাতীয় ক্যাডার বাহিনী এপ্রিলের শেষ দিক থেকে শহরে রাইফেল কাঁধে টহল দিতে শুরু করে (আবছার ২০১৮)। এ সময় রাজা ত্রিদিব রায় তার অধীনস্ত সার্কেলের সকল হ্যাডম্যান ও কার্বারীদের পাহাড়ি রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তার নির্দেশ দেন। উপজাতীয়

যুবকদের একটি খণ্ডিত অংশ মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিলেও অধিকাংশই পরবর্তীতে হানাদার সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ত্রিদিব রায়ের প্রেসক্রিপশনে গঠিত 'সিভিল আর্মড ফোর্স' নামের পাহাড়ি সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতায় অংশ নেয়। এই বাহিনীতে তুলনামূলকভাবে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের অনুসারীর সংখ্যা ছিল বেশি। রাজার নির্দেশে হ্যাডম্যান, কার্বারীরা তাদের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে পাহাড়ের অসংখ্য সাধারণ লোকদের সিএএফ বাহিনীতে ভর্তি করায়। তবে অনেক পাহাড়ি স্বেচ্ছায় বেতন, সুযোগ সুবিধা, স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ি ও জায়গা জমি দখল, অস্ত্র ও রাইফেল পাওয়ার লোভে এই বাহিনীতে যোগদান করে (ইবরাহিম ৭৭-৭৮)। বরকলে চাকমা জনগোষ্ঠীর অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা অশোক মিত্র কার্বারী মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়ায় তাঁর ঘরবাড়ি দখল করে নেয় তাঁরই স্বজাতীয় চাকমা রাজাকাররা যারা পরবর্তীতে পাহাড়ি শান্তি বাহিনীর সদস্য হিসাবে কাজ করে (কার্বারী ২০২২)।

১৩ এপ্রিল নাগাদ পাক বাহিনী রাঙামাটি শহরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পরেও দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা, মুক্তিবাহিনীর রাঙামাটির মহাছড়িতে অবস্থানের কারণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ও সামরিক কৌশলগত প্রতিকূলতার কারণে রাঙামাটি শহরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকে। ১৪ এপ্রিল শান্তি কমিটির নেতাদের সাথে বৈঠকের পর থেকে ত্রিদিব রায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ত্রিদিব রায় রাউজানে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে তাদের রাঙামাটি শহরে প্রবেশের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজা ত্রিদিব রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> One of the Muslim leaguers said he had contacted the army at Raozan ...he said, the army was not prepared to believe the offer of non-resistance unless I guaranteed it personally. I could have sent representatives to meet the army; my father-in-law volunteered. It was a risk I could not allow others to take on my behalf. Firstly, the Mukti Bahini might open fire on them on the way to Raozan, Secondly, the army, made out to be worse than the hordes of Genghis Khan, who shot at right as well as committed atrocities, might not accept anyone but me as I was the Chakma Raja as well as the elected leader of the Tracts. One of the visitors also was against sending representatives in my place as their bonafides might be in question (219).

সিদ্ধান্ত হয় রাঙামাটি শহর থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাউজান প্রেরণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে রাঙামাটি শহরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হবে। রাঙামাটি শান্তি কমিটি ও ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বে ১৫ এপ্রিল রিজার্ভ বাজার ও তবলছড়িতে দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদিব রায়ের ভগ্নিপতি কর্নেল হিউম, ভাই জনি, মুসলিম লীগের সিনিয়র নেতারা শান্তি কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশে বক্তৃতা রাখে। রিজার্ভ বাজারের জনসভায় মুসলিম লীগ নেতা এইচ.টি হোসেন বক্তৃতায় রাঙামাটিতে পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশের ইঙ্গিত প্রদান করে বলে, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম শহরের দখল নিয়েছে এবং রাঙামাটির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। যেকোন সময় পাক আর্মি রাঙামাটি শহরে প্রবেশ করতে পারে, পাকিস্তানের সংহতি ও নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের উচিত তাদের অভ্যর্থনা জানানো (আহমেদ ২০১৮ ও ২০২২)।' তবলছড়ি বাজারের জনসভায় শান্তি কমিটির লোকেরা 'প্রো-পাকিস্তান' শ্লোগান দিতে শুরু করে এবং 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। অবশেষে ১৬ এপ্রিল ভোরে রাজা ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রথমে রাউজান, রাউজান থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস, সেনানিবাস থেকে চট্টগ্রাম মার্শাল ল' হ্যাডকোয়ার্টার হয়ে কাপ্তাই পর্যন্ত যোগাযোগ তৈরি করে। রাজা ত্রিদিব রায়ের ভাষ্য মতে,

> Early next morning, 16 April perhaps, we set off for Raozan in two Jeeps and a Landrover. The rebels had installed some machineguns at Ghagra, 12 miles from Rangamati. Their position was beside the Dak Bungalow (Rest House) on the top of a steep hill overlooking the junction of the Chittagong-Rangamati and Kaptai-Chandraghona road ...Fortunately we were neither waylaid

> non fired upon and reached the road barrier at Raozan, about 30 miles from Rangamati, without misadventure. …A Junior commissioned officer received us and led us into a small building. This was the office of the Captain-in-change. While we waited, soldiers brought us mugs of hot sweet milky tea. Later, the Captain advised us that we had better proceed to the East Bengal Regimental Centre at Nutanpara, where the army was headquartered (219-220).

চট্টগ্রামের নতুনপাড়া সেনানিবাসে দীর্ঘ আলোচনার পর দুপুর নাগাদ ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটিকে চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র কাজিরদেউরী সার্কিট হাউজে মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। সার্কিট হাউজে দু'জন সিনিয়র সামরিক অফিসারের সাথে তাদের আলোচনায় হয়। কর্নেল হিউমের সাথে সার্কিট হাউজে ঢাকা থেকে সদ্য চট্টগ্রামে আসা এক জেনারেলের দেখা হয়। কিন্তু রাঙামাটিতে সৈন্য প্রেরণ ও রাঙামাটি দখলে নেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনো আসেনি। কর্নেল হিউম, রাজা ত্রিদিব রায়, রাঙামাটির সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট মোনেম চৌধুরী সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর কাপ্তাই হয়ে পাক সেনাদের রাঙামাটি প্রবেশের প্রাথমিক আলাপ শেষ করে। ১৬ এপ্রিল বিকেল নাগাদ ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ হাটহাজারী, রাউজান হয়ে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা করে অন্যদিকে মোনেম চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্য গ্রুপটি সামরিক কর্তৃপক্ষের চিঠিসহ কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রাজা ত্রিদিব রায় এ প্রসঙ্গটি এভাবেই তুলে ধরেছেন,

> Eventually Angus Hume Spotted a newly arrived General from Dhaka whom he knew. He took me over and introduced me to the General. We explained the desirability of taking over Rangamati without use of force and assured him there would be no armed resistance. After some discussion he agreed to send a young naval officer named Khan to his brother Lt. Col. Z.A. Khan at Kaptai, the one detailed for the capture of Rangamati... Armed with the General's letter, Monem Chowdhury and some others went along with the naval officer to Kaptai. The rest of us returned to Rangamati (220-221).

১৬ এপ্রিল সন্ধ্যার আগেই হাটহাজারী-রাউজানের পথ ধরে রাজা ত্রিদিব রায় রাঙামাটি পৌঁছে অন্যপথে কাপ্তাই হয়ে সড়ক ও লেক দিয়ে ঐ রাতেই পাক বাহিনীর একটি গ্রুপ বিনা বাধায় রাঙামাটি শহরে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে কালুরঘাটের পতনের পর বান্দরবান-কাপ্তাই হয়ে রাঙামাটিতে প্রবেশ করা মুক্তিযোদ্ধারা মহালছড়িতে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে। রাঙামাটি শহরে পৌঁছার পর হানাদার বাহিনী ডিসি বাংলো, এডিসি বাংলো, পুলিশ সুপারের বাংলো, মহকুমা প্রশাসকের বাংলো, পুলিশ লাইন হাইস্কুল, শাহ বহুমুখি স্কুল, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা পরিষদের বাংলো কাম অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে। পাক সেনারা শহরে দখল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাহাড়ি ও শান্তি কমিটির সদস্যরা ব্যাপকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অনেক প্রভাবশালী পাহাড়ি নেতা ও ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যান, কার্বারি, উপজাতীয় রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী, সিভিল আর্মড ফোর্সের সদস্য, মুসলিম লীগ কর্মী ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সহায়তায় পাক বাহিনী রাঙামাটি শহরে নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু করে (আবছার ২০১৮)।

রাজা ত্রিদিব রায়ের সরাসরি নিমন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাক বাহিনীর রাঙামাটি শহরে প্রবেশের খবর সব জায়গায় একই সাথে দ্রুত প্রচারিত হয়নি। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে রাঙামাটি থেকে একটি ছোট মুক্তিযোদ্ধাদের দল ডিসি ইমামের তত্ত্বাবধানে মাত্র কয়েকদিনের ট্রেনিং নিয়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাট পতনের পূর্ব থেকে পাহাড়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাঁরা রাঙামাটিতে প্রথম ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত (টীকা)। প্রথমব্যাচের মুক্তিযোদ্ধারা রাঙামাটিতে পাক হানাদারদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংবাদ পায়নি। পর্যাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের অভাবে প্রথম ব্যাচের যোদ্ধারা মহালছড়ি থেকে রাঙামাটির দিকে ৩টি স্থানীয় কাঠের বোট নিয়ে রাঙামাটি লেক ধরে ১৬ এপ্রিল মাঝরাতে যাত্রা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বহনকারী তিনটি বোটের প্রথমটি রাঙামাটি শহরের পুলিশ

লাইনস্থ ঘাটে আসা মাত্রই পাক বাহিনীর হাতে সশস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়ে। এই বোটে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল শুক্কুর, এস.এম. কামাল, শফিকুর রহমান, ইফতেখার, ইলিয়াছ, আবদুল বারি, সোলায়মান, আনোয়ার হোসেন মন্টু, রাগীব হাসান মামুন ও আবুল কালাম আজাদ ধরা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। অন্য দুটি বোট পরিস্থিতি টের পেয়ে পেছনে ফিরে যায়। প্রথম বোটে থাকা মন্টু লাফ দিয়ে লেকে ডুব দিয়ে অন্ধকার রাতে বেঁচে গেলেও ধৃত অপর ৭ জনকে পুলিশ লাইনস্থ টর্চার সেলে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। দীর্ঘ সময় নির্যাতনের পর মে মাসের শুরুর দিকে মানিকছড়ির গহীন অরণ্যে নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে তাঁদের হত্যা করা হয় (আলম ২০১৮)। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী রাঙামাটি দখলে নেওয়ার পর রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রেসক্রিপশনে ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আলীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আলী ও ম্যাজিস্ট্রেট মোনেম চৌধুরী মিলে রাঙামাটির প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উল্লেখ্য ডিসি ইমাম, এডিসি সামাদসহ স্বাধীনতাকামী অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা পার্শ্ববর্তী ভারতে গমন করলেও ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত রাঙামাটি সদর মহকুমার এসডিও আবদুল আলী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছিল। ১৬ এপ্রিল দুপুরে ম্যাজিস্ট্রেট মোনেম চৌধুরী ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এসডিও আলী'কে রাঙামাটিতে আসার সংকেত দেয়। সীমান্ত থেকে গোলাবারুদ ভর্তি বোটসহ ডিসি বাংলোর ঘাটে পৌঁছা মাত্রই বড় সন্তান হারুনসহ আবদুল আলীকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি করার পর তথ্য উদ্ধারের নামে পিতা ও পুত্রের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনের বর্ণনা রাঙামাটি সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আল্লামা নুরুল আলম হেজাজী দিয়েছেন এভাবে-

> একদিন আছরের নামাজের সময় বের হয়ে দেখি এসডিও আলী সাহেবকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে (বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড) দঁড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় জীপের ভিতর বসিয়ে রাখা হয়েছে, কিছুক্ষণ পর বুটজুতা দিয়ে লাথি দিয়ে তাঁকে জীপের ভিতর থেকে নিচে রাস্তায় ফেলা হয়। তাঁর হাঁটু দুইটা আগেই ভেঙ্গে দেয়ায় তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। জীপের পেছনে বেঁধে তাঁকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তা ছিল এক বীভৎস ও নির্মম দৃশ্য। এর আগে তাঁকে কাপ্তাই এর পেপার মিল ও জলবিদ্যুৎ এলাকায়ও নিয়ে যাওয়া হয়। জুমার নামাজে পাক বাহিনীর অত্যাচারের বিষয়ে জনমত সৃষ্টির কথা বলায় পাক বাহিনী আমার উপর (হেজাজী সাহেব) হুলিয়া জারি করে (২০১৭)।

পুলিশ লাইনের দারোয়ানের সহায়তায় আবদুল আলীর পুত্র ইউসুফ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও টানা ১২-১৪ দিন ধরে নির্যাতনের ফলে আবদুল আলীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। ইট দিয়ে আঘাত করে সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়। উত্তপ্ত তেলের কড়াই দিয়ে শরীরে ছ্যাঁকা দিতে দিতে শরীরে পঁচন ধরে যায়। এভাবে অমানুষিক নির্যাতনের পর শরীর অকেজো হয়ে পড়লে তাঁকে হত্যা করে লাশ কাপ্তাই লেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় (সুনীল দে ২০১৯)। ১৯৭১ সালে বনরূপা, রিজার্ভ বাজার, তবলছড়ি ও আসামবস্তি নিয়ে গঠিত ছিল ছোট্ট রাঙামাটি শহর। পাক বাহিনী শহর দখলে নেওয়ার পর শহর জুড়ে রাজাকার ও ত্রিদিব রায়ের মদদপুষ্ট সিএএফ বাহিনীর সদস্যরা টহল দিত। পাক হানাদাররা তাদের সহায়তায় আসামবস্তি হিন্দু এলাকায় অভিযান চালায়। জুন মাস থেকে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৭ জুন আসামবস্তি থেকে ধরে নিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র দে, নিরঞ্জন চন্দ্র দে, নিরঞ্জন দে, সুবিমল বড়ুয়া, অমূল্য কুমার দে, শান্তি পদ দে ও সুনীল মুৎসুদ্দিকে বর্তমান আসামবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের পাহাড়ি ঘোনায় নিয়ে পাক বাহিনী হত্যা করে (চিত্তরঞ্জন দে ২০২২)। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাঙামাটি শহর থেকে দূরবর্তী সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত চাকমা রাজার আজ্ঞাবহ প্রজাদের সহায়তায় মহালছড়ি, বরকল, কাউখালি, রাজস্থলীসহ গহীন পার্বত্যাঞ্চলের নানিয়ারচর, লংগদু, বাঘাইছড়ি প্রভৃতি এলাকায় পাক বাহিনী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিদিব রায়ের বিরোধিতার প্রমাণ:

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই পর্যন্ত মৌলিক কোন গবেষণালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে যুদ্ধকালীন সময়ে পাহাড়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ও বিভিন্ন দলিলগ্রন্থে

পেশকৃত বর্ণনায় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রশাসন সার্ভিসে কর্মরত পাহাড়ি প্রতিনিধি শরদিন্দু শেখর চাকমা তাঁর *'মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম'* শীর্ষক গ্রন্থে ত্রিদিব রায় সম্পর্কে লিখেন-

> ইতোমধ্যে খবর রটে যে, রাজা ত্রিদিব রায় পাকবাহিনীর ঘোরতর সমর্থক হয়েছেন, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। সেজন্য খান সেনারা বৌদ্ধদের সঙ্গে ভালো আচরণ করছে। এরকম...। রাঙ্গামাটি পৌঁছে আমি রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করি এবং তার পরদিন সকালে আমি রাজবাড়িতে যাই। আমি রাজাকে আমার জন্য চট্টগ্রামের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখে দিতে অনুরোধ করি। তিনি তখনই আমার জন্য ব্রিগেডিয়ার (অব.) হাকসী বেগের কাছে নিজের হাতে একটি ক্ষুদ্র চিঠি লিখে দেন। রাজার সঙ্গে আমার দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। আমি তাকে বলি, আমার তো মনে হয় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার পক্ষে স্রোতের বিপরীতে যাওয়া ঠিক হয়নি। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে না, যদি ভারত পাকিস্তানকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে না পারে। আর ভারত পাকিস্তানকে পরাস্ত করতে পারবে না, কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে চীন এবং আমেরিকা রয়েছে। তারা কোনদিন পাকিস্তানকে ভারতের নিকট পরাজিত হতে দেবে না। রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি তিনি তখন পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি পাকিস্তানি হয়েছেন (২৯-৩০)।

এইচ.টি ইমাম ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আরো আগে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎপরতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন ও পাহাড়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশাসনিক সংগঠক হিসাবে ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল সময়ের শুরু থেকেই পাহাড়ী জনতা ও রাজা ত্রিদিব রায়ের অবস্থান ও তৎপরতা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিককার সময়ে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের অবস্থান সম্পর্কে এইচ. টি. ইমাম বলেন-

> রাঙামাটিতে আওয়ামী লীগ সংগঠন ছিল অতি দুর্বল। পৌর অধিকর্তা ছিলেন মুসলিম লীগের। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছিল দ্বিধাবিভক্ত, চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় প্রথম থেকেই নির্লিপ্ত এবং গোপনে পাকিস্তানিদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। চাকমারা প্রকাশ্যে যোগদান করতে চাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কাপ্তাই-চন্দ্রঘোনার দিকে তাকাতে হয়েছিল। শিল্প-এলাকা এবং বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের সমাবেশ।... অতএব এটা হলো আমাদের শক্ত ঘাঁটি। এখানে সৈয়দ আবদুস সামাদ বিরাট সহায়তা পেলেন (২৬০)।

চট্টগ্রামের পতনের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামমুখী মুক্তিযোদ্ধদের কমান্ড করেন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার মেজর মীর শওকত আলী। পার্বত্য চট্টগ্রামে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ২ মে রামগড়ের পতন পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এসব যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি রাজাকার ও মিজোরামের স্বাধীনতাকামী পাকিস্তানি মদদপুষ্ট মিজোরা হানাদার বাহিনীকে অনেক সহায়তা করে। এ সময় পাহাড়ের অনেক জায়গায় ত্রিদিব রায়ের প্রজাদের দ্বারা গঠিত 'সিএএফ' সদস্যরা হানাদার বাহিনীর গাইড হিসাবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে চাকমা রাজা ও চাকমা জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে মীর শওকত বলেন-

> আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুইমারাতে ডিফেন্স নিলাম। আমাদের তখন শক্তি ছিল প্রায় ৪৫০ জন। আমি মানিকছড়ির রাজার (মং রাজা, যিনি মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন) সঙ্গে দেখা করলাম। রাজা আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে মগদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন বলে জানালেন। রাজা পাকিস্তানীদের খবরাখবর দিলেন। সমগ্র মগ উপজাতি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। চাকমা উপজাতিদেরও হয়তো আমরা সাহায্য পেতাম। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরোধিতার জন্য তারা আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। মিজোরা বেশ কিছু আগেই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাসে মগ উপজাতি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে (রহমান ৯৪-৯৫)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রণাঙ্গনে প্রথম শহীদ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের। মহালছড়িতে পাক বাহিনী, মিজো ও পাহাড়ী রাজাকারদের সাথে সংগঠিত যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আফতাবুল কাদেরকে নিয়ে তাঁর সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির কর্তৃক লিখিত গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে চাকমা জাতি ও রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকার কথা ওঠে এসেছে এভাবে-

> যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী অবাঙালি এবং উপজাতি, সেহেতু তাঁদের আনুগত্য নির্ধারণ করা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সহজ ছিল না। তবে যেহেতু তাঁদেরকে পাকিস্তান বিরোধী বলা হতো তাই হয়তো অনুমান করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের দোদুল্যমান তখনকার পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজেদের সঠিক অবস্থান বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবেন। মার্চ মাসের প্রথম থেকেই রাজা ত্রিদিব রায় এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কোনো কারণে মুক্তিকামী বাঙালিদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। অনেক পাহাড়ি রাঙ্গামাটি শহর ছেড়ে চলে যায়। সে-সময় মিজোদের হঠাৎ আনাগোনা পরিলক্ষিত হয় (জহির ৬২-৬৩)।

প্রিয়জিৎ দেবসরকার বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী রাজনৈতিক বিশ্লেষক। পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিলেও দেবসরকার যুক্তরাজ্যের লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের রাজনীতি তাঁর আগ্রহের জায়গা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের উপর দীর্ঘদিন গবেষণা করে তিনি *'পশ্চিম পাকিস্তানের শেষ রাজা'* গ্রন্থটি রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> রাজা ত্রিদিব রায় ছিলেন ত্রিদিব রাজাকার বাহিনী (সাহায্যকারী বাহিনী)-র প্রধান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাঙামাটি এলাকার দায়িত্ব ছিল তাদের। এই কাজটি করতে গিয়ে অবশ্য রাজা ত্রিদিব রায় তার মুকুট ও রাজ্য হারানোর ঝুঁকি নেন। তিনি জনমতের বিপক্ষে চলে যান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত কাছের লোক হয়ে যান। রাজা ত্রিদিব রায় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করতেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ নির্দয়ভাবে বাঙালিকে দমন করবে। তার অনুমান ছিল ভারত সরাসরি এই দ্বন্দ্বে যুক্ত হবে না। সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিজয় অনেকটা সুনিশ্চিত (দেবসরকার ৯৬)।

বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠনে রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা:

১৯৭১ সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মুক্তিবাহিনীর অনুকূলে বদলে যায় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্যে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ত্রিদিব রায় পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি তখনও মনে করেছিলেন পাক সেনারা জিতবে এবং তার এখতিয়ারে থাকা যত সম্পদ ছিল তার সবটাই তিনি পাক সেনাদের অনুকূলে নিয়োজিত করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ত্রিদিব রায় সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে মাঠে নামে। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া সফরে বের হন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলোতে পাকিস্তানের পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা। ৯ নভেম্বর তিনি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পৌঁছেন। ব্যাংককে অবস্থানরত অবস্থায় ত্রিদিব রায় পাকিস্তান দূতাবাস থেকে একটি জরুরি তলব পান এবং তড়িঘড়ি করে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। পরে তাকে ঢাকায় তলব করা হয়। ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে জরুরি সাক্ষাৎ শেষে ১১ নভেম্বর আবার করাচি উড়ে যান। ১২ নভেম্বর করাচি পৌঁছার পর পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকারের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করেন। পাক সরকারের পক্ষে বৈশ্বিক আস্থা অর্জনের জন্য ২৫ নভেম্বর ত্রিদিব রায় শ্রীলঙ্কার কলম্বো সফর করেন। তার সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি জেট

বিমানগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পুনর্ভরণের ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা। ভারতের আকাশসীমা এড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে যাওয়ার জন্য কলম্বোকে একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করা। তখন পাকিস্তানের জন্য এই সুবিধাটি বন্ধ ছিল (দেবসরকার ৯৯-১০১)। কলম্বোতে ত্রিদিব রায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চেয়ারম্যান এবং যোগাযোগ মন্ত্রী স্যার সিরিল ডি সুজার সাথে সাক্ষাৎ করেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার কাছে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা না পেয়ে বিকল্প পথ নিশ্চিত করার নিমিত্তে ২৮ নভেম্বর নেপাল সফরের কথা থাকলেও ভ্রমণ পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ত্রিদিব রায় বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে অবতরণ করেন। রেঙ্গুন থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার ব্যাংকক সফর করেন। ত্রিদিব রায়ের এই কর্মব্যস্ত নভেম্বর-ডিসেম্বরের সফর বৃত্তান্তের উদ্দেশ্যই ছিল প্রায় পরাজিত হতে যাওয়া পাকিস্তানকে রক্ষায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সমর্থন আদায় করা। কিন্তু ইতোমধ্যে পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ত্রিদিব রায় থাইল্যান্ডের জান্তা প্রধান ফিল্ড মার্শাল কিত্তিকাচন এর সাথে বৈঠক করে ৮ ডিসেম্বর করাচিতে অবতরণ করেন (Roy 226-227)। কলম্বো ফিরিয়ে দিলেও ব্যাংকক বিকল্প পথ দেয় কিন্তু ততদিনে পাক আর্মির সময় ফুরিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় নৌ বাহিনী ততদিনে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পূর্ণ নৌ অবরোধ গড়ে তুলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আকাশসীমার ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর রাজা ত্রিদিব রায় গভীর মর্মাহত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তার চরমতম দুঃস্বপ্নটি বাস্তবে রূপ নেয় এবং তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পরেও ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তান প্রেমে একটুও ভাটা পড়েনি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে আনুগত্যের কারণে পাকিস্তান সরকার তাকে আজীবনের জন্য সম্মানিত করে (*Dawn*, 18 September 2012)। রাজা ত্রিদিব রায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অবস্থানের কারণে তার মনে কোন দুঃখ ও অনুশোচনা নেই (*The Express Tribune*, 18 September 2012)। ১৯৭২ সালে রাজা ত্রিদিব রায় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২৭তম সভায় পাকিস্তানের পক্ষে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে যুগোস্লাভিয়া নতুন সদস্য রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক ২৯৩৭ (XXVII) নম্বর প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো রাজা ত্রিদিব রায়কে বাংলাদেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের প্রধান নিয়োগ করেন। তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করার জন্য রাজা ত্রিদিব রায়কে কূটনৈতিক দক্ষতা দেখানোর সুযোগ দেন। রাজা ত্রিদিব এই অধিবেশনে সফল হন। শেখ মুজিব ঐ অধিবেশনে ত্রিদিব রায়ের মা রাজমাতা বিনিতা রায়কে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য করে জাতিসংঘে পাঠিয়েও ব্যর্থ হন। রাজমাতা ত্রিদিব রায়কে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে দেশে ফিরে আসতে বললেও রাজা ত্রিদিব তার মা ও জন্মভূমিকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত অধিবেশনে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পরীক্ষিত বন্ধু দেশ চীনের উপপররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়াও কুয়াম হুয়া এবং রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়ার নেতৃত্বে চীনা প্রতিনিধিদলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ত্রিদিব রায় চীনা প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য না করাতে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগে রাজি করাতে সফল হন। চীন জাতিসংঘের স্থায়ী পরিষদের সদস্য হওয়ায় ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সদস্য পদ প্রাপ্তিতে যুগোস্লাভিয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। জাতিসংঘে সাফল্যের ফলে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। অধিবেশন শেষে পাকিস্তানে ফিরলে ভুট্টো প্রটোকল না মেনে ব্যক্তিগতভাবে ত্রিদিব রায়কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডির চাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানের গণমাধ্যম ত্রিদিব রায়ের অর্জনকে ফলাও করে প্রচার করে। জাতীয় বীর এবং প্রেসিডেন্টকে বহনকারী মোটর শোভাযাত্রা ইসলামাবাদের সড়ক অতিক্রম করার সময় উৎফুল্ল জনতার ঢল ছিল। তার সম্মানে ভুট্টো ইসলামাবাদের 'গ্রেট ফ্ল্যাশম্যান'স হোটেলে এক স্বাগত ভোজসভার আয়োজন করেন (দেবসরকার ১০২-১০৫)।

রাজা ত্রিদিব আমৃত্যু পাকিস্তান প্রেম থেকে বের হতে পারেননি। পাকিস্তানের পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে ঐ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ত্রিদিব রায় স্পেন ভ্রমণ করেন। একই উদ্দেশ্যে ত্রিদিব রায় ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সফর করেন। রাজা ত্রিদিব ইসলামাবাদের ২৪৪৮ বি মারগেল্লা দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়িতে পর্বতের দৃশ্য উপভোগ করে ১৯৭১ পরবর্তী পাকিস্তানের নিস্প্রভ ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। ১৯৭৪ সালে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে পূর্ব জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নিউইয়র্ক, ভেনেজুয়েলা সফর করেন। পরবর্তীতে রাজা ত্রিদিব পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্বকারী একজন কূটনীতিকের জীবন অতিবাহিত করেন। বৃহত্তর দুনিয়ায় পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ফেরাতে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল, চিলি, ইকুয়েডর, পেরু ও উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের হাই কমিশনারের দায়িত্ব শেষে ত্রিদিব রায় ১৯৯৬ সালে চূড়ান্তভাবে ইসলামাবাদে ফিরে জীবনের শেষ সময়টুকু অতিবাহিত করেন (দেবসরকার ১০৭-১০৮)।

উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। শুধুমাত্র পার্বত্যাঞ্চলের একটা প্রথাগত ইউনিটের রাজা বা সার্কেল প্রধান ভেবে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠীসহ তার সার্কেলভুক্ত অসংখ্য পাহাড়ি জনতাকে মুক্তিসংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন। তার প্রজাদের সমন্বয়ে গঠিত পাহাড়ি সিএএফ বাহিনীর সহায়তায় পাক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালি জনতার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। অসংখ্য মানুষের উপর চালানো হয় নির্যাতন, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় আগুন, সংগঠিত করা হয় পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ও নারী নির্যাতন। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে ত্রিদিব রায় থেমে থাকেননি। বাংলাদেশের বিজয় যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র ঠিক ঐ সময়ে ত্রিদিব রায় বাংলাদেশের বিজয় ঠেকাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ দেশগুলোতে ঝটিকা সফর করে পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ক্ষত শুকাতে না পেরে ত্রিদিব রায় ভুট্টোর প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ক্ষতিসাধনে অংশ নিয়েছেন। আমৃত্যু পাকিস্তান প্রেম ত্রিদিব রায় ত্যাগ করতে পারেননি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করার পথ যদি বেছে না নিতেন তাহলে শেখ মুজিব ও ত্রিদিব রায়ের মধ্যকার স্বায়ত্তশাসন দাবির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থানটি কেমন হতো সেটি একটি আগ্রহোদ্দীপক দেখার মতো বিষয় হতো। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের দালাল আইনে রাজা ত্রিদিব রায়কে স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। ত্রিদিব রায় আজও অতি অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রমী সংখ্যালঘু রাজাদের একজন হয়ে রয়েছেন যিনি জীবনের শেষ দিন অবধি পাকিস্তানের ভাবাদর্শের প্রতি অনুগত থেকেছেন। প্রিয় দেশ পাকিস্তানের প্রতি ত্রিদিব রায়ের ভালোবাসা ও অঙ্গীকার ছিল প্রশ্নাতীত। ইতিহাসে নিশ্চিতভাবেই তার স্থান হবে পশ্চিম পাকিস্তানের শেষ রাজার জায়গায় যিনি কিনা আমৃত্য পাকিস্তানের নাম জপে গেছেন। 'পাকিস্তান পাকিস্তান' বুলি আওড়াতে আওড়াতে ২০১২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজা ত্রিদিব রায় তার প্রিয় পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

অধ্যাপক ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো *পার্বত্য চট্টগ্রাম: ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি*, রেগা প্রকাশনী, ২০১৮।

আনন্দ বিকাশ চাকমা, *সরকারী নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৮৬০-২০০০)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, আগস্ট ২০১৮।

আহমদ আমীন চৌধুরী *ইতিহাসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ ও রাউজান*, বলাকা প্রকাশন, ২০১২।
এএসএম সামসুল আরেফিন (সম্পাদনা) *বাংলাদেশের নির্বাচন (১৯৭০-২০০১)*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩।
এইচ.টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৪।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির *মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের বীরউত্তম*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
ড. জাফর আহমদ (সম্পাদক) *রাঙ্গামাটি বৈচিত্র্যের ঐকতান*, রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, ২০০৪।
প্রিয়জিৎ দেবসরকার (অনুবাদঃ রইসুল হক বাহার) *পশ্চিম পাকিস্তানের শেষ রাজা*, বাতিঘর, ২০১৬।
মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১।
মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর *আহাদিসুল খাওয়ানিনঃ চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস* (অনুবাদঃ খালেদ মাসুকে রসুল), অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।
রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা পাবলিকেশন, ২০১৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১।
লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, নাজমহল, ১৯৯১।
শরদিন্দু শেখর চাকমা *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম*, জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০১৩।
সিদ্দিক সালিক (ভাষান্তরঃ মাসুদুল হক) *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।
সৈয়দ আব্দুস সামাদ, *যখন দুঃসময়, সুসময়ঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচালি*, প্রকাশক- আনিকা জাঈদা খানম, ২০০৬।
হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ নবম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪।

Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh Memoirs of an American Diplomat,* UPL, 2002.
Henry Rickets 'Report on the Forays of the wild tribes of Chittagong Frontier' in *Selections from the Records of the Bengal Government,* N. XI, 1853.
Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam, Superintendent of Government Printing, 1909.
Lt. Gen (Reld) Mir Shawkat Ali (BU, PSC), *The Evidence, Vol-I, The Liberation war the Begining,* Somoy Prakashan, 2008.
Mohammed Ishaq (General Editor) *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts,* Bangladesh Government Press, 1971.
Raja Tridiv Roy *The Departed Melody (Memoirs),* PPA Publication, 2003.
S. Mahmud Ali *The Fearful State: Power, People and internal war in South Asia,* Zed Books, 1993.

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ রণ বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, ছাত্রলীগ নেতা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য (খাগড়াছড়ি), তারিখঃ ১৭.৭.২০১৮।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ সুনীল কান্তি দে, সদস্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ (রাঙামাটি), তারিখঃ ২৩.৩.২০২০।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ গৌতম দেওয়ান, আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ (রাঙামাটি), তারিখঃ ৬.৮.২০১৯ ও সুনীল কান্তি দে, সদস্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, তারিখঃ ১৭.৪.২০১৯।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ রবার্ট রোনাল্ড পিন্টু, মুক্তিযোদ্ধা, কাপ্তাই, তারিখঃ ১১.৫.২০১৮।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ শাহদাৎ হোসেন চৌধুরী, সাবেক ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা, কাপ্তাই, তারিখঃ ১১.৫.২০১৮।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ হেমদা রঞ্জণ ত্রিপুরা, রামগড় সংগ্রাম কমিটির সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, খাগড়াছড়ি, তারিখঃ ১২.১২.২০২২।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, সদস্য খাগড়াছড়ি সংগ্রাম কমিটি, তারিখঃ ১২.১.২০১৭।
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ আবদুল ওয়াহাব, বান্দরবান সংগ্রাম কমিটির সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, তারিখঃ ১৭.৬.২০১৯।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: নুরুল আবছার, রাঙামাটি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা, তারিখ. ১৮.৫.২০১৮ ও ১৬.১২.২০২২ ও রুহুল আমীন, মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থী নেতা (রাঙামাটি), তারিখ. ১৯.৫.২০১৮।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: অশোক মিত্র কার্বারী, মুক্তিযোদ্ধা, বরকল, রাঙামাটি, তারিখ.১৭.১২.২০২২।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: এ. কে.এম. মকছুদ আহমেদ, রাঙামাটির প্রবীণ সাংবাদিক, ১৯৭১ সালে *দৈনিক আজাদী*'র রাঙামাটি প্রতিনিধি। তিনি *'দৈনিক গিরিদর্পণ'* নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তারিখঃ ২২.১২.২০১৮ ও ২৬.৬.২০২২, স্থানঃ দৈনিক গিরিদর্পণ অফিস, জেলখানা মোড়, রাঙামাটি পৌরসভা।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: নুরুল আবছার, রাঙামাটি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা, তারিখ. ১৮.৫.২০১৮ ও ১৬.১২.২০২২; আনোয়ার হোসেন মন্টু, সাবেক ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা, রাঙামাটি, তারিখঃ ১৯.৬.২০১৮।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: দিদারুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (রাঙামাটি), তারিখঃ ২.৪.২০১৮।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মৌলানা নুরুল আলম হেজাজী, প্রতিষ্ঠা রাঙামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, তারিখঃ ১৩.১২.২০১৭।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: সুনীল কান্তি দে, সদস্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ (রাঙামাটি), তারিখঃ ১৭.৪.২০১৯।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: চিত্তরঞ্জন দে, মুক্তিযোদ্ধা, আসামবস্তি, রাঙামাটি, তারিখঃ ৯.১২.২০২২।

Dawn, 18 September 2012.
The Express Tribune, 18 September 2012.

টীকা: পাহাড়ি নেতারা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একপাক্ষিক মন্তব্য প্রদান করেন। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এইচ.টি ইমাম ও স্থানীয় স্বাধীনতাকামী নেতাদের প্রতি পাহাড়িদের একপাক্ষিক অভিযোগ রয়েছে। পাহাড়ি জনতা প্রচার করে জেলা প্রশাসক ও নেতারা পাহাড়িদের অবিশ্বাস করে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আরো অভিযোগ করে যে সমস্ত পাহাড়ি যুবক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। পাহাড়ি নেতারা এভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ড লুকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা রণ বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, মুক্তিযোদ্ধা প্রীতি কান্তি ত্রিপুরা, কমান্ডার হেমদা রঞ্জণ ত্রিপুরা, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব সুনীল কান্তি দে, মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন, মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন মন্টু, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আবছার পাহাড়িদের এমন অভিযোগের ভিত্তি নেই মর্মে মন্তব্য করেছেন। উল্টো পাহাড়ের সকল মুক্তিযোদ্ধা এক সুরে মন্তব্য করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ সদস্য রাজা ত্রিদিব রায়ের নির্দেশে পরবর্তীতে হিল রাজ বাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করে।

টীকা: এই বৈঠকের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রাঙামাটি শহরের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আবছার, মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমীন ও ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক এ.কে.এম. মকসুদ আহমেদ।

টীকা: রাঙামাটির প্রথম ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন- ইফতেখার (রাঙামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের ছেলে), আবদুস শুকুর (পিতাঃ দেলোয়ার), *শহীদ* মোহাম্মদ শফিকুর রহমান (রাঙামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মুজিবুল হক-এর ভাইপো), *শহীদ* মামুন, এস.এম. কামাল (পিতাঃ মুজিবুল হক), মাহবুবুর রহমান (ব্যবসায়ী), আবুল কালাম আজাদ, সুনীল কান্তি দে (তৎকালীন ছাত্রনেতা), দিদারুল আলম (বর্তমানে পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), রণ বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (তৎকালীন ছাত্রনেতা ও বর্তমানে রাজনীতিবিদ), প্রভুদাস চৌধুরী মার্মা, গৌতম দেওয়ান (তৎকালীন ছাত্রনেতা), মোহাম্মদ ইয়াছিন (তৎকালীন বনবিভাগের কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি), অনিল চন্দ্র দাস (তৎকালীন পশুসম্পদ বিভাগের কর্মচারী), কানু বিশ্বাস (পিতাঃ যতীন্দ্র লাল বিশ্বাস), বাবুল বিশ্বাস (পিতাঃ যতীন্দ্র লাল বিশ্বাস), আনোয়ার হোসেন মন্টু, আলমগীর (পিতাঃ খলিল), জাহাঙ্গীর (পিতাঃ খলিল) মোঃ ইলিয়াছ, আবদুল বারি, রাগীব হোসেন মামুনসহ আরো বেশ কয়েকজন।